Chapter - 2

(Conceptual Frame work of the study good governance - meaning - concept - theory - What is municipality - Reaction between Good governance and Municipality -)

বিংশশতাব্দীর শেষ দশকে এবং একবিংশ শতাব্দীতে শাসন (governance) এবং সুশাসন (Good governance) ধারণাটা কেতাবি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে (Academic) এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত তত্ত্বে ((Development literature)) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেতাবি দৃষ্টিভঙ্গি মূলত একটি সমাজের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের কাঠামোর সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকে। শাসন এর এই কেতাবি দৃষ্টিভঙ্গি কর্তৃত্ব প্রয়োগের দ্বারা নাগরিকদের রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্য সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ নীতি নির্ধারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

'শাসন' বিষয়ক ধারণাটি কিন্তু কোন নতুন ধারণা নয়। এটি মানবসভ্যতার আদিকাল থেকেই আলোচনার বিষয়ে হয়ে চলেছে। সরলার্থে 'শাসন' ধারণাটির অর্থ হল - সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং সিদ্ধান্ত প্রয়োগ কার্যকরী অথবা কার্যকরী না করার পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে আনুষ্ঠানিক এবং অ-আনুষ্ঠানিক কারকগুলির বিশ্লেষন এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ণের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক কাঠামোগুলির আলোচনা গুরুত্ব পেয়ে থাকে। শাসন সংক্রান্ত ধারণাটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার হতে পারে, যেমন - কর্পোরেট শাসন,(Corporate Governance) আন্তর্জাতিক শাসন, (International Governance), জাতীয় শাসন National Governance আবার স্থানীয় শাসন (Local Governance)।

শাসন সংক্রান্ত ধারণাতে সরকার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারক হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু সরকার ছাড়াও বিভিন্ন স্তরের শাসন অনুযায়ি, বিভিন্ন কারক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। জাতীয় স্তরের শাসনে বহুজাতিক কোম্পানী, মিডিয়া, গণমাধ্যম, অসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ ((NGOS)) , নাগরিক সমাজ ইত্যাদি কারকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে । আবার স্থানীয় স্তরের শাসনের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী জমিদার , কৃষক বা শ্রমিক সংঘ, সমবায় সমিতি , ধর্মীয় নেতা, ইত্যাদি কারকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারক। পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়ণের আনুষ্ঠানিক কারক হিসেবে সরকার খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত কিচেন কাবিনেট (Kitchen Cabinates) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিক কারক হিসেবে স্বীকৃত।

Governance বা শাসন শব্দটি সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের একটি রিপোর্টে আফ্রিকা মহাদেশের সাহারা সংলগ্ন অঞ্চলের সামগ্রিক অনগ্রসরতাকে বোঝাতে বিশ্বব্যাঙ্ক "Bad Governance" পারে শব্দটি ব্যবহার করেছিল। বিশ্বব্যাঙ্কের এই রিপোর্টটিতে 'শাসন' বিষয়ক দর্শন এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে চারটি প্রধান মানদন্ড Parameters নির্ধারিত হয়েছিল।

১) জনক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা (Public sector management)

২) দায় বদ্ধতা , (৩) উন্নয়নের আইনি কাঠামো (৪) তথ্য এবং স্বচ্ছতা।

ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য সংক্রান্ত আলোচনাতে সুশাসন একটি নতুন রাজনৈতিক মাত্রা যুক্ত করেছিল। বিশ্বব্যাঙ্ক ১৯৯২ সালে একটি Governance and Development বিষয়ক সংক্রান্ত রিপোর্টে শাসন এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিল - শাসন এর অর্থ হল - ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে সেই দেশের উন্নয়নকে তরান্বিত করা। বিশ্বব্যাঙ্ক তার রিপোর্টে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে নীতির বাস্তায়নের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, সঠিক বাজেটারি ব্যবস্তাপনার অভাব, সর্বস্তরে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতি এবং জনগনের ঔদাসীন্যের কারণে জন অংশ গ্রহনের অভাব, প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার অভাব, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন এই বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছিল। ১৯৯২ সালের রিপোর্ট বা দলিলে বিশ্বব্যাঙ্ক শাসন সংক্রান্ত ধারনাটির ৪টি প্রয়োগিক মাত্রা নির্ণয় করেছিল -

১) রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার আকার আকৃতি

২) দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পদের ব্যবস্থনায় সরকারি ক্ষমতা কি পদ্ধতিতে বা কোন প্রক্রিয়ায় অনুসৃত হয়।

৩) সরকারের নীতি নকশা তৈরি, নীতি প্রণয়ন এবং নীতির বাস্তায়ণের সামর্থ্য।

৪) দায়বদ্ধতা

এই প্রেক্ষাপটে সুশাসন বিষয়ক ধারনাটি উন্নয়ন প্রশাসনে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। উল্লেখ্য যে জন প্রশাসনে ১৯৮০ এর দশক থেকে সুশাসন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মূলত পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠা নয়া উদারনীতির তত্ত্বের রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রভাবে। এই নয়া উদারনীতিবাদ মুক্ত বাজার ব্যবস্থা এবং বেসরকারির ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখলে জন প্রশাসনে সুশাসন ধারণাটির আবির্ভাব এবং জনপ্রিয়তা লাভ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণ ছিল। ১৯৮০ দশকের শেষে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের পতনের ফলে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি গ্রহনযোগ্য এবং টেকসই বিকল্পের প্রয়োজন হয়ে পরেছিল। আমলাতন্ত্র নির্ভর উন্নয়ন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দারিদ্রতা, বিপুল আর্থ-সামাজিক অসাম্য , অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা, এক ব্যাপক সামাজিক ব্যধির সৃষ্টি করেছিল। ১৯৮০র দশকের শেষ দিকে বেশির ভাগ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এই দেশগুলির শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সম্পদের পরিকল্পিত সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণে ব্যর্থতা এবং সর্বপরি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার । এই পরিস্থিতিতে সুশাসন বিষয়ক ধারনাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। বিশ্বব্যাঙ্ক সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি সুশাসন ধারণাটির বিভিন্ন সংজ্ঞা নিধারণ এবং বিভিন্ন বৈশিষ্টের উল্লেখ করতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে সমগ্র বিশ্বে সুশাসন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা পরিলক্ষিত হতে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ন্যায় সঙ্গত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সুশাসন ধারাণটির জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে।

বিশ্বব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রদত্ত সুশাসন এর ধারনা এবং বৈশিষ্ট্যগুলিকে আলোচনার

পূর্বে সুশাসন বিষয়টিকে আরেকটু বিশদ করা যেতে পারে।

সরকার, শাসন এবং সুশাসন

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সুশাসন ধারনাটি বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জন প্রশাসন শাস্ত্রের পাশাপাশি উন্নয়নমূলক সাহিত্য চর্চাতেও ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি গনতন্ত্র, নাগরিক সমাজ, জনঅংশগ্রহন, মানবাধিকার, টেকসই পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনাতেও বর্তমানে সুশাসন সংক্রান্ত ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। ১৯৯০ দশকে বিশ্বব্যাঙ্কের বিভিন্ন রিপোর্টে শাসন এবং সুশাসন দুটি শব্দই দৃষ্টি গোচরে এসেছে।

শাসন শব্দটি (Governance) সরকার (Government) শব্দটির থেকে অনেক বৃহত্তর ধারনা। সরকার বলতে প্রতিষ্ঠানিক বৈধ ক্ষমতা বা কর্তৃপক্ষকে বোঝানো হয়। অন্যদিকে শাসন বলতে সমাজের সমবেত লক্ষ্য পূরনের কর্তৃত্ব মূলক সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয় । শাসন এর এই কাজে সরকার ছাড়াও নাগরিক সমাজ, বাজার ইত্যাদি বহুকারকের অস্তিত্ব স্বীকৃত। সরকারের সর্বপ্রথম কাজ হল জনস্বার্থ পূরনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া। অন্যদিকে শাসন হল সরকার অপেক্ষা বৃহত্তর পরিবেশ যথা রাজনৈতিক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রের সন্নিবদ্ধতার বর্ণনা। নীতিনির্ধারণ এবং নীতির বাস্তবায়ণ হল শাসন এর প্রধান কাজ। সুতরাং শাসন হল সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া এবং সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ণের প্রক্রিয়াতে যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কারকগুলি যুক্ত থাকে তার আলোচনা। আর সরকার হল এক্ষেত্রে একটি আনুষ্ঠানিক কারক। সরকার ছাড়াও বিভিন্ন স্তরের শাসনে বিভিন্ন কারক যেমন নাগরিক সমাজ, বাজার ব্যবস্থা, গনমাধ্যম, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি কারক যুক্ত থাকতে পারে। সুশাসন একটি ধারাবাহিক বা নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এটি নিজে থেকে বিকশিত হতে পারে না। এটি একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়া যার প্রতি যত্নশীল হতে হবে। সুশানের প্রতি জনগণের দাবী মেটানোর লক্ষ্যে।

স্বাক্ষরতা , শিক্ষা, বৃত্তি গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করে চলতে হবে। পাশাপাশি সরকারকেও এই সমস্ত দাবির প্রতি দায়বদ্ধতা প্রমান করতে হবে। সুশাসন এর ক্ষেত্রে একটি সুদক্ষ ও কার্যকরী গনতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। সুশাসন একটি উদ্দেশ্য মুখী প্রশাসন এর সমতুল্য , যেটি জনগনের জীবনযাত্রার মনোন্নয়নের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পাই পানান্দিকার সুশাসন এর সজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন - সুশান বলতে বোঝায় নাগরিকদের একটি শান্তি পূর্ণ, যুক্তি সঙ্গত, সমৃদ্ধশালী এহং অংশগ্রহন মুখী জীবনযাত্রার পথে বাধাগুলিকে জাতি রাষ্ট্র দূরীভুত করবে।

আবার বিবেক চোপরা সুশাসনকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন সুশাসন হল সমাজের প্রাথমিক মূল্যবোধগুলিকে দ্ব্যর্থহীনভাবে চিহ্নিত করা এবং তাকে অনুসরন করা।

আবার The organisation for Economic co-operation and development (OECD) এর ১৯৯৭ সালের রিপোর্টএ সুশাসন এর ধারনাতে অংশগ্রহনমুখহীন উন্নয়ন, মানবাধিকার এবং গনতন্ত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । সুতরাং সুশাসন এমন একটি কাঠামো প্রস্তুত করে যাতে সমাজে বৃহত্তর সহমতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অনগ্রাধিকারগুলি নির্মিত হবে এবং একই সঙ্গে সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র ও অসুরক্ষিত বা ক্ষতিগ্রস্থ অংশের স্বার্থ, মতামত এবং কণ্ঠস্বর সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত হতে পারে এবং এর মধ্য দিয়ে দারিদ্রতা প্রশমন এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটানো।

আবার ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বা ইউ.এন.ডি.পি সুশাসন এর সজ্ঞা প্রদান করতে

গিয়ে উল্লেখ করেছে একটি দেশের সকল স্তরের কার্যকলাপের যথাযথ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতায় প্রয়োগ ঘটানোকে সুশাসন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউএনডিপি এর সুশাসন সংজ্ঞায় রাষ্ট্র ছাড়া ও বেসরকারি ক্ষেত্রে এবং নাগরিক সমাজকেও অন্তর্ভূক্তি করা হয়েছে। সুস্থায়ী মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই তিনটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে ইউ.এন.ডি.পি উল্লেখ করে বলেছে, রাষ্ট্রের মূল কাজ হল সুস্থায়ী উন্নয়নের উপযুক্ত রাজনৈতিক এবং আইনগত পরিবেশ সৃষ্টি করা। তেমনি নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনৈতিক এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার সহায়ক হবে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে জনগনের অংশগ্রহনমুখী করে তোলার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী র মধ্যে সচেতনতা বা সচলতার সৃষ্টি করবে।

আবার বিশ্বব্যাঙ্ক সুশাসনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছে যে এটি একটি বিশেষ কার্য পদ্ধতি যার দ্বারা একটি দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে সেই দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ক্ষমতার প্রয়োগ করাকে সুশাসন বলে অভিহিত করেছে। রাষ্ট্রসংঘের ইউ.এন.ডি.পি তার Governance for sustainable Human Development এর রিপোর্টএ সুশাসনের আটটি মুখ্য বৈশিষ্ট্যর উল্লেখ করেছে। নিম্নে এগুলি বিশদ ভাবে আলোচিত হল।

১) অংশগ্রহন -নারী এবং পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহন প্রত্যক্ষ হতে পারে অথবা বৈধ প্রতিষ্ঠানিক কর্তৃকপক্ষের মাধ্যম হতে পারে, আবার প্রতিনিধির মাধ্যমে হতে পারে । তবে অংশগ্রহণকে সংঘবদ্ধ হতে হবে এবং ওয়াকিবহাল বা তথ্যাভিজ্ঞ হতে হবে। এর অর্থ হল সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার এবং মতামত প্রকাশের অধিকার একদিকে স্বীকৃত হবে। অন্যদিকে সুসংঘবদ্ধ নাগরিক সমাজের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হবে। তবে একটা কথা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার, পরোক্ষ অংশগ্রহণ বা প্রতিনিধিত্ব মূলক গণতন্ত্রে সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত এবং বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠস্বর বা তাদের স্বার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হতে হবে।

২) আইনের অনুশাসন - সুশাসনের জন্য একটি পক্ষপাতহীন আইনি কাঠামোর আবশ্যিক প্রয়োজন। এর পাশাপাশি মানুষের অধিকারগুলি যথাযথ সংরক্ষনের প্রয়োজন । বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইনের পক্ষপাতহীন প্রয়োগ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত, পক্ষপাতহীন এবং দুর্নীতি মুক্ত পুলিশ বাহিনীর সুশাসনের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন।

৩) স্বচ্ছতা -স্বচ্ছতার অর্থ হল যথাযথ নিয়মানুসারে এবং আইনানুসারে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত এবং বলবতকবণ হবে। এর পাশাপাশি এই সকল সিদ্ধান্তের গ্রহণ ও বলবতকরণ যাদের ওপর প্রভাব ফেলবে তাদের এই সকল সিদ্ধান্তের বিষয়ে সকল তথ্য সহজলভ্য এবং সহজগম্য ভাবে জানার অধিকার থাকবে। অর্থাৎ নাগরিকদরে সহজলভ্য ভাবে এবং পর্যাপ্ত ভাবে তথ্য সর বরাহ করা হবে এবং তথ্যগুলি বোধগম্য হতে হবে।

৪) সংবেদনশীলতা - সুশাসনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যধারার ফলাফল প্রদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অংশীদারীদের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দেবে। আবার শাসক কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত রূপায়নের প্রক্রিয়ায় যদি শাসিতদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সেই প্রতিক্রিয়ার প্রতি শাসককে দৃষ্টিপ্রদান করতে হবে। অর্থাৎ শাসিতের আবেদনে শাসককে সাড়া দিতে হবে।

৫) সহমত ভিত্তিক - সমাজে বিভিন্ন কারক থাকে। পাশাপাশি বিভিন্ন মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজমান থাকে। সুশাসনের লক্ষ্যে সমাজের এই বিভিন্ন দৃষ্টিকোন এবং বিভিন্ন স্বার্থ সমূহের মধ্যে মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় এবং এই মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে সমাজের সকল সম্প্রদায়ের যথাযত স্বার্থ রক্ষার মধ্য দিয়েই সুশাসনে পৌছানো যেতে পারে। এছাড়া স্থায়ী মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে (sustainable human development) একটি দীর্ঘমেয়াদি পরপ্রেক্ষিত রচনা করা। সংশ্লিষ্ট সমাজের ঐতিহাসিক , সংস্কৃতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষিতেই তা রচনা করার মধ্য দিয়েই সুস্থায়ী মানবউন্নয়নের লক্ষ্যটিকে অর্জন করা যেতে পারে।

শাসন কর্তৃপক্ষের গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত সমাজের সকল পক্ষের সহমতের ভিত্তিতে হবে। জোর করে উপর থেকে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। সহমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত রূপায়নে সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হবে।

৬) সাম্য ও অন্তর্ভূক্তি -

একটি সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন বা সুস্থতা নির্ভর করে সমাজের সকল সদস্য যদি নিজেদের সেই সমাজের অংশ বলে মন থেকে মেনে নেয় এবং সমাজের মূল স্রোত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে না করে। এর অর্থ হল সমাজের সকল গোষ্ঠি, বিশেষতঃ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ বা অবহেলিত এবং বঞ্চিত সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনের বা তাদের উন্নতির সুযোগ সুবিধাগুলি উন্মুক্ত থাকবে। ধনসম্পদের সমান বন্টণ নিশ্চিত হতে হবে। এবং প্রত্যেককে যোগ্যতা অনুযায়ী আয়ের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এই ভাবেই সুশাসনের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

৭) কার্যকারীতা এবং দক্ষতা

সুশাসন এর অর্থ হল সকল প্রতিষ্ঠান সমূহ ও অনুসৃত পদ্ধতি সমূহ যথাযথ ফলা ফল প্রদান করবে, যাতে সম্পদ সমূহের সুষ্ঠ বিন্যাস ঘটিয়ে বা সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সকল সামাজিক লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হতে পারে।

৮) দায়বদ্ধতা - দায়বদ্ধতা হল সুশাসনের একটি অপরিহার্য উপাদান বা শর্ত। শুধুমাত্র সরকারি প্রতিষ্টানই নয়, পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষেত্র এবং নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলিও জনগনের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। সাধারণত কোনো সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে, যাদের উপর এদের সিদ্ধান্তগুলি বা কার্যকলাপ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কোন পরিপ্রেক্ষিতে, কী কারণে, কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে, তার জবাবদিহি করা এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য শাসন কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সকল প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষকে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। তবে স্বচ্ছতা ও আইনের শাসন ছাড়া দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ উপরের দুটি শর্ত পূরণ হলে তবেই দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হতে পারে।

উপরিক্ত আলোচনা থেকে পরিস্কার যে সুশাসন হল একটি আদর্শ, যেটি সম্পূর্ণ ভাবে অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। খুব কম রাষ্ট্র বা সমাজই সুশাসনের আদর্শের নিকটবর্তী জায়াগায় পৌছাতে সক্ষম হয়েছে। তবে টেকসহ বা সুস্থায়ী মানব উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করতে হলে সুশানের আদর্শকে বাস্তবায়িত করার দিকে পদক্ষেপ করতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সুশাসনের আলোচনায় সমগ্র বিশ্ব জুড়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এগুলি হল -

ক) তথ্যের অধিকার খ) ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স গ) গনতান্ত্রিক বহুত্ববাদ। এগুলি সুশাসনের আলোনায় বর্তমানে ব্যাপক গুরুত্ব পাচ্ছে। আবার মানবাধিকার, পরিবেশ রক্ষা বর্তমানে সুশাসনের ধারণাতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

সমালোচনা - বিশ্বব্যাঙ্ক যে ধরনের সুশাসনের বিষয়সূচী প্রদান করেছে, তা অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে বিশ্লেষণ করে অনেকেই মনে করছেন যে এগুলি আসলে পুঁজিবাদী মতাদর্শের রাজনৈতিক কাঠামো অর্থাৎ নয়া উদারনীতিবাদী দর্শনকে দীর্ঘ মেয়াদী অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াস। অর্থাৎ পুঁজিবাদ কে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া এবং টিকিয়ে রাখার জন্য সুশাসন এর নামে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে উন্নয়নের নামে ধোঁকা দেওয়া বা শোষন বঞ্চনার নতুন পদ্ধতি। সুশাসনকেই উন্নয়নের একমাত্র বিকল্প করে গড়ে তোলার এই প্রয়াসের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করে গড়ে তোলার এই প্রয়াসের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। সুশাসনের নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কোন অগ্রাধিকার নীতির উল্লেখ নেই কেন? তাছাড়া স্বচ্ছতা , দায় বদ্ধতা এগুলির পরিমাপ করা কিভাবে সম্ভবপর হতে পারে? বিশ্বব্যাঙ্ক সুশাসনের ধারণায় অতিরিক্ত মাত্রায় বেসরকারিকরণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমরা অভিজ্ঞাতায় লক্ষ্য করেছি যে, সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বেরে বিভিন্ন প্রান্তে স্থানীয় সরকার, স্থানীয় স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী এবং অসরকারি সংগঠনগুলি যোগ্য বিকল্প হিসাবে ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয়েছে। সুতরাং প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক বিশ্বব্যাঙ্ক বা পশ্চিমি সংস্থাগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? সার্বভৌমত্বের সংকোচন ঘটিয়ে বাজার অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার? গনতন্ত্রের জন্য উদ্বেগ না কি উদার গণতন্ত্রে বা বকলমে পুঁজিবাদী মতাদর্শের আধিপত্য বিস্তারের চিন্তা? সামগ্রিক সমস্যা সমাধানের যে অন্যান্য গ্রহনযোগ্য বিকল্প থাকতে পারে, তা আধিপত্যকারী দাতা এই সংস্থাগুলির কাছে গ্রহন যোগ্য প্রস্তাব বলে বিবেচিত হচ্ছেনা।

ভরতবর্ষে সুশাসনের বিকাশ এবং বর্তমান অবস্থান

সুশাসনের ধারনা ভালতে খুবই প্রাচীন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেক রাজা বা সম্রাট বা নবাবের নাম নাই। যাহা সুশাসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থখানিতে সুশাসক এবং সুশাসনএর গুণাবলি বিস্তৃত ভাবে আলোচতি হয়েছে। কৌটিল্যের মতে, সেই রাজাই সুশাসক, যে নিজেকে জনগনের ভৃত্য হিসেবে মনে করবেন। প্রজাদের আনন্দ তাদের কল্যানই হবে রাজার আনন্দ এবং কল্যান। এইভাবে প্রজাবাৎসল্য রাজার শাসনকেই কৌটিল্য সুশাসন হিসেবে তুলে ধরেছেন। গুপ্তযুগে মৌর্যযুগ, মুঘলযুগেও আমরা বেশ কিছু সুশাসকের সুশাসন এর অস্তিত্ব পেয়েছি। ইংরেজ শাসকদের মধ্যেও কিন্তু ভারতপ্রেমী বা প্রজামঙ্গলকামী শাসক মনোভাবপন্ন শাসকের অস্তিত্বের সাক্ষ্য ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে যে বিশেষ অর্থে ১৯৮০ দশকের শেষ দিক থেকে সুশাসন ধারনাটি সমগ্র বিশ্বে আলোচিত হচ্ছে, আধুনিক ভারতে তার বাস্তবায়ন এর দিকে কতটা অগ্রসর হয়েছে তা লক্ষ করা যাক।

আধুনিক ভারতে সুশাসনের এই ধারনাটি আলোচি হচ্ছে ১৯৯৯১ সালের পর থেকে। ১৯৯১ সাল থেকে সরকারি ক্ষেত্র গুলির সংস্কার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। ১৯৯৬ এবং ১৯৯৭ সালে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের বেং প্রধান

সচিবদের সুশাসন প্রবর্তন এর জন্য কেটি কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছিল এবং নানান উদ্যোগ ও গৃহীত হয়েছিল। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ- বিকেন্দ্রায়ন, শাসনকার্যে জনগনের অংশগ্রহন, নাগরিক অধিকার সম্বলিত সনদ ঘোষনা।

কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় সুশাসনের মডেল কোড রচনা, নাগরিকদের অভাব অভিযোগের নিস্পত্তির ব্যবস্থা, তথ্যপুঞ্জের ব্যবহারের মাধ্যম, উন্নত ও হতপরি সুনিশ্চিত করার জন্য -গভর্ন্যান্স প্রচলন। তথ্যের অধিকার আইন প্রভৃতি দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০০২-২০০৭) সুশাসন প্রবর্তনের লক্ষ ঘোষনা করা হয়েছিল। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০০৭-২০১২) বলা হয়েছিল যে, "All of our efforts to achieve rapid and inclusive development will come to rought, if we cannot ensure good governance"

দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে (২০০২-২০০৭), কতকগুলি পদক্ষেপ কার্যকরী করা হয়েছিল। ২০০৫ সালে লাগরিকদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে তথ্যের অধিকার আইন বলবৎ করা হয়। আবার ন্যাশানাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক, (২০০৫) প্রকল্প বা ন্যাশ্যানল রুরাল হেল্থ মিশন (NRHM) প্রকল্পগুলি চারুকরার মধ্যদিয়ে অংশগ্রহন মূলক শাসন ব্যবস্থা শুরু হয়। পরিষেবার উন্নতির জন্য ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা চালু করা হয়। ২০০৫ সালে দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছিল বিরাপ্পামাইলির নেতৃত্বে (প্রথমটি ১৯৬৬ সালে) দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন এর রিপোর্টে কার্যকরী এবং দায়বদ্ধ প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল। রিপোর্টে একটি Code of Governance এর প্রস্তাব ও গৃহীত হয়েছিল - পরিষেবা প্রদানে অগ্রগতি, দুর্বল ও পশ্চাদপদ শ্রেণির জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে গ্রহন। প্রযুক্তি ব্যবস্থার উন্নতি স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, জনসেবা এবং দুর্নীতি বিরোধী প্রশাসন এইগুলি গুরুত্ব পেয়েছিল।

একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০০৭-১২) স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতায়ন ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি। আইনের শাসন , শক্তিশালী বিচার ব্যবস্থা, বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্ম বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাসকরা এগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল। জাতীয় মনো রিপোর্ট ২০০২ তে সুশাসনের লক্ষ্যে বিকেন্দ্রীকরনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর, সরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশাসনিক সংস্কার, জনগনের সঙ্গে সরকারের সংযোগ বৃদ্ধির জন্য পদ্ধতিগত সংস্কার, নারী , প্রান্তিক ও সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন এর কথা উল্লিখিত হয়েছে।

ভারতবর্ষে ই-গভর্ন্যান্স -

তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বর্তমানে যে বিপ্লব দেখা দিয়েছে, তার জেরে বৈদ্যুতিন শাসন বা ই-প্রশাসন নিয়ে এখন সমগ্র বিশ্বেই ব্যাপক আলোচনা চলছে। ই-গভর্ন্যান্স বর্তমানে সুশাসনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। ই-প্রশাসন স্থানিক দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামের সঙ্গে শহরের সরকারি কার্য্যালয়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করে। কর্মী সংখ্যা কমায়, খরচ বাঁচায় , সরকারি ব্যবস্থায় অপচয় রোধ করে এবং লম্বা লাইন ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সরাসরি সংযোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে থাকে।

অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার রাজ্যবাসীর জন্য 'আপনার সেবায়' বা 'মি সেবা' বলে একটি বাতায়ন খুলেছে।

রাজ্যজুরে প্রায় ৬ হাজার 'মি সেবা' কাউন্টার রোজ গড়ে ৫০ হাজার আবেদন নিবেদন সামলায় বর্তমানে তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে দৈনিক ১ লক্ষ পর্যন্ত গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই 'মি সেবা' ব্যবস্থায় সকল ই-গভর্ন্যান্স প্রকল্পগত উদ্যোগগুলিকে সংহত করে সরকারি তরফে নাগরিকদের দেয় পরিষেবাগুলিকে আরও দ্রুত ও সুনিশ্চিতভাবে বোঝানোর প্রয়াস নিয়ে 'সই-সাবুদ' এর দীর্ঘ সূত্রতার অবসান ঘটানো সম্ভব হয়েছে। এই পরিষেবায় একদিকে মানুষের আবেদন-নিবেদন গ্রহন করা হয়, অন্যদিক সংলগ্ন তথ্যকোষ বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করে সংশ্লিষ্ট আবেদনগুলির দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়। রাজস্ব, পঞ্জীকরন ও নিবন্ধন, পুর-প্রশাসন, শিক্ষা এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারী দফতরকেই মূলত এই 'মি সেবা' ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে।

মহারাষ্ট্র সরকার খরচ হ্রাস করা, তথ্য সংরক্ষনের পরিসর বৃদ্ধি, যে কোনোও জায়গা থেকেই প্রয়োজনে এই তথ্য ব্যবহারের সুবিধা সফট্ ওয়ার আপ-টু-ডেট না রেখেও কাজের সুবিধা প্রভৃতি উদ্দেশ্য 'মহাগভ ' ব্যবস্থা চালু করে। রাজ্য তথ্য কেন্দ্রে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে নানান দফতর এখন এটিকে ওয়েবসাইট ও বিভিন্ন পরিষেবা চালু রাখার জন্য কাজে লাগায়। ৮২টি সরকারি দফতরের মধ্যে 'কাজ' আওতায় এবং এরা ৭০টি নানান ধরনের পরিষেবা বজায় রেখেছে।

জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স পরিকল্পনার আওতায় 'ই-ডিস্ট্রিকট' বলে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। জেলাস্তরে সরকার এবং নাগরিকদের মধ্যে সবধরনের মত বিনিময় সংঘটিত করা, বিভিন্ন দফতরের কাজের বিন্যাস এবং মানষকে যথাযথ পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই ই-ডিস্ট্রিকট কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। এই কর্মসূচিতে নাগরিকদের সুবিধার জন্য জেলা, তহশিল, মহকুমা ও ব্লকস্তরে নাগরিক সহায়তা কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু এই ই-ডিস্ট্রিকট প্রকল্পের কাজ অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলেছে।

<u>পশ্চিমবঙ্গে ই-গভর্ন্যান্স</u>

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুশাসনের লক্ষ্যে পরবর্তী দশকগুলিতে যাতে ই-গভর্ন্যান্স পরিষেবা বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই জন্য ২০০৩ সালে নতুন ইনফরমেশন টেকনলজি (IT) পলিসি চালু করেছে। এই ক্ষেত্রটিতে চাকরি বৃদ্ধি এবং প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর একদিকে যেমন সুযোগ ঘটাবে, অন্যদিকে সরকারি পরিষেবায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে এই ই-গভর্ন্যান্স উদ্যোগ রাজ্যে ব্যাপক ভাবে শিল্পায়ন ঘটাতেও সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০০৭ সালের মে মাসে রিলায়েন্স কমিউনিকেশন সংস্থাটি পশ্চিমবঙ্গে ই-গভর্ন্যান্স প্রজেক্টের দায়ভার গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গে আর.সি.এম স্থাপন করা হয়েছে, যাতে ১৮৬০টি সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র খোলা হয়েছে (Common Service Center)। যার উদ্দেশ্য হল সরকার থেকে সরকার (Government to Government) , সরকার থেকে ব্যবসা (Government to Business) , ব্যবসা থেকে ব্যবসা (Business to Business) , ব্যবসা থেকে গ্রাহক (Business to Customer) ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করার জন্য নিজস্ব মডেল স্থাপন করা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনস্থ করেছে যে পশ্চিমবঙ্গের অধিক জনঘনত্ব সম্পন্ন জায়গাগুলিতে যেখানে যথাযথ তথ্য পরিকাঠামো নেই, সেখানে অনুমতি প্রাপ্ত তথ্য সেবা কেন্দ্র (Kiosks) খোলা। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল

পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলির নাগরিকেরাও যাতে সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ বজায় রাখতে পারে, তারজন্য একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা।

মূল্যায়ন - জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স কর্মসূচি চালু হওয়া সত্ত্বেও দেশে ই-গভর্ন্যান্স প্রকল্পটিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রযুক্তি কাঠামোর অপ্রতুলতা আছে। ই-গভর্ন্যান্স এর সম্পূর্ণ রূপায়নের জন্য কারিগরি হার্ডওয়ার এবং সফ্‌ট ওয়ার পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার। এজন্য আরও উৎকৃষ্ট এবং দ্রুত গতিসম্পন্ন উপযুক্ত সংযোগ ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে।

দেশে সরকারি পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তিগত উদ্যোগ এ পর্যন্ত বেশ ধীর গতিতেই এগিয়েছে এবং এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা পি.পি.পি. গড়ার প্রয়াস অত্যন্ত সীমায়িত। সমগ্র বিশ্বেই ই-গভর্ন্যান্স পরিষেবা ও কর্মসূচিকে দক্ষ, দ্রুত এবং ধারাবাহিক করে তুলতে পি.পি.পি. মডেল বিশেষ ফলপ্রসূ হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অর্থাভাব, দক্ষতার ঘাটতি, সরকারি ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা এবং প্রশংসনীয় কাজের ক্ষেত্রে উৎসাহ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় এই কর্মসূচি মুখ থুবড়ে পরে। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। ই-গভর্ণমেন্ট ব্যবস্থায় পি.পি.পি. আনা হলে একদিকে যেমন এই সব সমস্যা অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা যাবে, তেমনি বেসরকারি ক্ষেত্রের সামনেও সুযোগ বৃদ্ধি ঘটতে পারে।

পরিশেষে উল্লেখ করা দরকার ই-গভর্ন্যান্স সুশাসনের একটি হাতিয়ার মাত্র। দায়িত্বশীল আধিকারিকদের নজরদারী এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের যথাযথ যত্নশীল উদ্যোগ ব্যতিরেকে এটি সঠিক ভাবে চলতে পারে না। ই-গভর্ন্যান্স এর সাফল্যের জন্য চাই সরকার, সাধারণ নাগরিক এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের সক্রিয় অংশী দায়িত্ব।গ্রাহক তথা বৈদ্যুতিন সরকারি পরিষেবা ব্যবহারকারীদের ইনপুট বা চাহিদা এবং ফিটব্যাক অর্থ্যাৎ পরিষেবা সম্পর্কে তাদের মতামত ই-গভর্ণান্সকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য আবশ্যক। আমাদের দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশ নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে এই সকল নতুন মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে সুশাসনের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলা যায়, সেটাই আজ আমাদের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

তথ্যের অধিকার - সুশাসনের অধিকার -

স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা , সুশাসনের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট । এই বৈশিষ্ট সুনিশ্চিত করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল শাসন প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের আরও বেশি করে অংশ গ্রহন এবং সরকারের কাজ সম্পর্খে সচতেনতা অর্থাৎ জানার অধিকার অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ।

ভারতীয় সমসদে ২০০৫ সালে তথ্যের অধিকার আইনটি পাশ হয়েঝিল। এই আইনটির সবাদে নাগরিকরা সরকারের কাজকর্মা ও প্রকল্পগুলির বিষয়ে তথ্য জানার অধিকার পেয়েছেন। এটি একটি ঐতিহাসিক আইন, যা সরকার বেং সাধারন নাগরিকদের মধ্যে ক্ষমতার সমীকরন এবং শাসন সংক্রান্ত প্রচলিত ধারনা আমূল বদলে দিতে পারে। । সেই জন্যই তথ্যের অধিকারকে সংবিধানের ১৯(১) নম্বর ধারায় মৌলিক অধিকারের মর্যদা দেওয়া হয়েছে।

তথ্যেহ অধিকার আইন কীভাবে সাধারন মানুষের ক্ষমতায়ন , সুশাসন ও অংশগ্রহনমূলক গনতন্ত্রে ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে, তা একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক।

ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহন - এই আইনটি গৃহীত হওয়ার আগে শাসন ব্যবস্থা গোপনীয়তার মোড়কে আবৃত ছিল। সরকার স্বতঃ প্রনোদিতভাবে যেটুকু জানতে অর্থাৎ সরকার ও আমাদের বদান্যতার উপর জানার পরিধি নির্ভর করত। কিন্তু তথ্যের অধিকার আইন গোপনীয়তার যুগ শেষ করে সরকারী কাজকর্ম সম্পর্কে নাগরিকদের জানার অধিকার প্রদান করে তাদের ক্ষমতার অলিন্দে পদচারনা করার অধিকার ও প্রদান করেছে। ক্ষমতা আসে জ্ঞান থেকে - ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকোর এই বক্তব বর্তমান প্রযুক্তি চালিত এই তথ্য বিপ্লবের যুগে ক্ষমতায়নের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে তথ্যের মধ্যে, এই বক্তব্যই সত্য প্রমান করে থাকে । তথ্যেহ অধিকার আইন সাধারন মানুষকে শাসন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে উৎসাহ বৃদ্ধি করে। মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে এই ইচ্ছা থাকলেও, সরকারি কাজে যোগ দেবার উপায় তাঁরা খুঁজে পেতেন না। এই আইন সরকারের কাজকর্ম সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহনের পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছে। নাগরিকদের জীবনযাত্রার উপর প্রভাব ফেলে যে শাসন প্রক্রিয়া, সে সম্পর্কে জানতে তারা আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

দায়বদ্ধতা -

শাসনব্যবস্থার দায় বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তথ্যের অধিকার আইনের ভূমিকা অপরিসীম। আইন , শাসন এবং বিচার - সরকারের এই তিনটি বিভাগের কাজকর্মে গোপনীয়তার যে আবরন বর্তমান ছিল, তা দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজে করত। পাশাপাশি লাল ফিতের ফাঁস ও আমলাতন্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতাকেও প্রশয় দিতে সেই গোপনীয়তা সরকারি আধিকারিক ও আমলার তাঁদের কাজের জন্য জনগনকে জবাব দিতে বাধ্য ছিলেন না।

তথ্যের অধিকার আইন এই কুপ্রথার অবসান ঘটিয়ে, আধিকারিকদের কাছ থেকে সরাসরি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর জানার অধিকার প্রদান করেছে। অর্থাৎ আধিকারিকদের মর্জির উপর আর নাগরিকরা নির্ভরশীল নয়। এই দায়বদ্ধতা সরকারি আধিকারিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সচেতনতাও বৃদ্ধি করে ছে।

স্বচ্ছতা -

সুশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হল স্বচ্ছতা। এর সাম্প্রতিক বিচারে (২০১২) স্বচ্ছতার নিখে ১৭৬ টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৯৪। আবার ৫৪ শতাংশ ভারতীয় নিজেদের কাজ করাতে ঘুষ প্রদান করে থাকেন বলে এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে,।

তৃণমূল স্তর থেকে বা উচ্চস্তরীর ক্ষমতার অলিন্দ বল্গাহীন এই দুর্নীতি প্রতিরোধের সামর্থ তথ্যের অধিকার আইন রয়েছে । কমনওয়েলথ গেমস থেকে টুজি স্পেকট্রাম একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারি এই আইন বলব ? হওয়ার পর প্রকাশ্যে এসেছে। তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় করা প্রশ্নমালা। একাধিক মুখোশ খুলে দিতে সক্ষম হয়েছে। আমলাতান্ত্রিক নির্লিপ্ততার দুর্ভেদ্য দুর্গ ভাঙতে সাধারন মানুষের সবথেকে শক্তিশালী হাতিয়ার হল এই তথ্যের অধিকার আইন।

প্রবন্ধকতা

তথ্যের অধিকার আইনের যাত্রাপথ কিন্তু মোটেই খুব সহজ হয় নি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা এসেছে। প্রথম প্রতিরোধ এসেছিল আইনের নির্মাতদের কাছ থেকে। আইন নির্মিত হওয়ার পরও সরকারি

[Page-11]

আধিকারিকদের কাছ থেকেও তথ্য সরবরাহর ব্যাপারে বাধা আসতে থাকে। এক্ষেত্রে তথ্য কমিশনারদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ

তথ্যের অধিকার আইনের ক্ষমতা সীমায়িত রাখার উদ্দেশ্য সরকার বহুবার আইনটি সংশোধনের চেষ্টা করেছে। সি.বি.আই -কে এর আওতার বাইরে রাখতে সরকার সফল্য হয়েছে। ২০০৬ সালে সরকার , ফাইলে লেখা নোটকে সাধারন মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে একটি সংশোদনীর প্রস্তাব করে। তবে নাগরিক সমাজ ও সাধারন মানুষের তীব্র প্রতিবাদের মুখে সরকার তা প্রত্যাহীর করে নেয়। তাই তাঁদের অধিকার ক্ষুন্ন করার কোনও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নাগরিকদের সদাসর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

উপসংহার - সবথেকে যে কথাটি বলার তা হল, সাধারন মানুষকে এই আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংযমী হতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই যে তথ্য জানতে চাওয়া হয়, তা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারকে ক্ষুন্ন করে থাকে। এমন চলতে থাকলে ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার অজুহাতে সরকার যেকোন সময়ে এই আইনের ক্ষতা কমিয়ে দিতে পারে। এছাড়া ব্যক্তিগত শত্রুতা মেটানোর জন্য অনেক সময় এই আইনকে অপব্যবহার করা হচ্ছে। যেটি কখনও কাম্য নয়। এক্ষেত্রে একটি পরামর্শ হল সরকার পক্ষের উচিত , তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন আসা অবধি অপেক্ষা না করে স্বতঃ প্রনোদিত ভাবে সকল তথ্য সরবরাহ করা। তাতে একদিকে যেমন সুশাসনের পথ সুগম হবে তেমনি অন্যদিকে সরকার ও নাগরিকদের মধ্যেকার পারস্পরিক বিশ্বাস্য বৃদ্ধি পাবে।